এজাক্সে এপলবিস রেটুরেন্টটা কিংস্টন রোডের ঠিক পাশেই। একটু দোকানে যাচ্ছে বলে বাসা থেকে বেরিয়েছে মিজান। সাড়ে ছয়টার দিকে এপলবিসে চলে এলো। রহমতকে বলেছিল তাড়াতাড়ি আসতে। মালেক এবং জিনিয়া আসার আগে। তারা আধুনিক যুগের ছেলেমেয়ে, তাদের কাছে আধি ভৌতিক বিষয়ে কথা বার্তা বলার আগে একটু চিন্তাভাবনা করা ভালো, নইলে শুনেই হয়ত নাক সিটকাবে, ভাববে কুসংস্কারছন্ন।

ভেতরে ঢুকে রহমতকে চার জনের একটা টেবিল বাগিয়ে বসে থাকতে দেখে আদৌ অবাক হল না মিজান। এই ব্যাটা এই রকমই। তাকে যুতসই একটা সমস্যা দিলে সে যতক্ষন না সেই সমস্যার সমাধান হচ্ছে ততক্ষণ সেটা নিয়েই বুদ হয়ে থাকতে পারে। মিজানকে দেখে সে দুই হাত তুলে দৃষ্টি আকর্ষন করল। মুখোমুখি বসল ওরা। কফির অর্ডার দিল। রহমতের চোখে মুখে পরিষ্কার উত্তেজনার চিহ্ন।

"প্ল্যান কি বল?" জানতে চাইল সে।

"ওদেরকে বলব আমার সাথে এসে থাকতে," মিজান বলল। "তুই ঠিকই বলেছিলি। ওরা একই জেনারেশনের। ওদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে যেতে পারে।"

"তাতে তোর কি লাভ? ওরাতো তোর সাথে সারা জীবন থাকবে না। জুলেখা ভাবীকে সারিয়ে তুলতে হবে"।

"কিন্তু এটা যে একটা অসুখ সেটাই বা ভাবছিস কেন? যদি সত্যি সত্যিই জ্বীনের আছর হয়ে থাকে, তাহলে কি করে সারাব?"

রহমত গলা নামিয়ে বলল, "শোন, আমি প্রথম থেকেই জ্বীন-ভুত করছি, মানছি। কিন্তু এটা অন্য কিছুও হতে পারে। সেই জন্য কোন সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখানোটা জরুরী। মালেক আর জিনিয়া যদি তোর সাথে কয়েক দিন থাকে, তাহলে তুই হাতে একটু সময় পাবি। ওরা বাসায় থাকলে তোর ভয়টাও একটু কমবে। ভাবীও হয়ত একটু সমঝে চলবে। সেই সময় সাইকিয়াট্রিস্টের সাথে একটা এপয়েন্টমেন্ট নে। "

"আচ্ছা, নেব। এখন বল, আমার দুই ছেলেমেয়েকে কি বলব? জুলেখা সম্বন্ধে খারাপ কিছু বলাটা ঠিক হবে না। তাহলে ওরা আমাকে দোষারোপ করার একটা সুযোগ পাবে। বিশেষ করে জিনিয়া। আমি আবার বিয়ে করি, একেবারেই চায় নি ও।"

রহমত মাথা নাড়ল। "মাল্টিপল পার্সোনালিটি সম্বন্ধে কিছুই বলিস না। জ্বীন – ভুতের ব্যাপার তো তুলবিই না। বলতে পারিস, একটু আধটু মানসিক সমস্যা থাকতে পারে। তুই তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে চাস। সেই জন্য ওদের সাহায্যের তোর দরকার।"

মিজান চিন্তিত ভাবে বলল, "যা যা ঘটেছে ওগুলো বলব না?"

মাথা নাড়ল রহমত। "একেবারেই না। তুই কি ওদেরকে ভয় পাইয়ে দিতে চাস? আগে থেকেই একটা আতংকের মধ্যে থাকলে কখন বন্ধুত্ব হবে? হয়ত দেখা করতেই চাইবে না।"

কফি চলে এসেছে। দু'জনে নীরবে কফিতে চুমুক দিল।

রহমত বলল, "ওরা আসার আগে আরেকটা আলাপ সেরে নেই। গতকাল দৌলত মিয়াকে আবার ফোন দিয়েছিলাম, মোবাইলে। এইবার ধরল। ভদ্রলোক স্ত্রীকে অনেক ভয় পায়। আমি পরিস্থিতি তাকে জানিয়ে খুব কাকুতি মিনতি করলাম। কেন যেন মনে হচ্ছিল, আমাদেরকে সব খুলে বলে নি। ভদ্রলোক আমাদের সাথে দেখা করতে রাজী

হয়েছে। ”
চমকে ওঠে মিজান। “বলিস কি? সেদিন তো কথাই বলতে চাচ্ছিল না!”
“আরে, মানুষ চরিয়ে খাই। কাকে কিভাবে পটানো যায় ঠিকই ধরে ফেলি। বললাম, জুলেখা ভাবীকে রক্ষা করাটাই আমাদের উদ্দেশ্য। উল্টো পাল্টা কিছু করলে, পুলিশি সমস্যা হতে পারে। তাকে সারা জীবন জেলের ঘানি টানতে হবে। কাজ হয়ে গেল। হাজার হোক আত্মীয় তো!”
“কোথায় দেখা করবে? কখন?” মিজান ঘড়ি দেখল। সাতটা বেজে গেছে। ছেলেমেয়েরা এসে পড়বে। এদেশে বড় হয়েছে। তাদের সময় জ্ঞান আবার খুব টনটনে।
“আজকে তাদের টরন্টো আসার কথা - তবলিগে। এক আত্মীয়ের বাসায় উঠবে। আজ রাতেই এশার নামাজের পর দেখা করবে বলেছে। ড্যানফোর্তের আবুবকর মসজিদে।”
“একটা কাজের কাজ করেছিস। আমারও মনে হচ্ছিল ভদ্রলোক ঝেড়ে কাশছে না।”
রেস্টুরেন্টের সদর দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল মালেক এবং জিনিয়া। চারদিকে তাকিয়ে মিজানকে খুঁজছে। একজন হোস্টেস ওদেরকে অভিবাদন জানাতে এগিয়ে গেল।
“দশটার মধ্যে মসজিদে থাকতে হবে আমাদের,” রহমত বলল। “এখান থেকে যেতে কম করে হলেও আধা ঘন্টা লাগবে। সুতরাং সাড়ে নয়টার মধ্যেই এখানকার পর্ব সারতে হবে।”
হোস্টেস মেয়েটি মালেক এবং জিনিয়াকে মিজানদের টেবিলে নিয়ে এল। মালেক সব সময় পরিপাটি করে থাকতে পছন্দ করে, সেই ছোটবেলা থকেই। সে কোট প্যান্ট পরে এসেছে। সুদর্শন, সাধারণের চেয়ে লম্বা। অফিস কাট চুল। পরিষ্কার করে শেভ করা। প্রথমে রহমতের সাথে হাত মেলালো সে, পরে মিজানের সাথে কোলাকুলি করল। একটা চেয়ারে বসল। তাকে দেখে মনে হল না বাবার প্রতি তার তেমন কোন রাগ টাগ আছে। ছেলেটা নায়লার মত, মনে মনে ভাবল মিজান। ভদ্র, নম্র, স্বল্পবাক। প্রায় ত্রিশের মত বয়েস হতে গেল, এখনও কেন সে একলা ভেবে পায় না মিজান। নায়লা বেঁচে থাকতে ছেলেকে বিয়ে দেবার অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু রাজী করাতে পারে নি। সে মিষ্টি হেসে বাবা-মাকে বলেছে, তার মনের মানুষের সাথে যখন দেখা হবে তখনই সে বিয়ে করবে। বোঝাই যাচ্ছে সেই দেখা আজও হয়নি, কখন হবে কিনা সন্দেহ আছে।
জিনিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। সে একটা স্কার্ট এবং ঢিলা টি শার্ট পরে এসেছে, মাথার চুল একটা রিবন দিয়ে আটকিয়ে পেছনে ঝোলান। পায়ে খাট হিলের জুতা। সে মাঝারী গড়নের, লাবণ্যময়ী, কালো চোখ, লালচে চুল, ছটফটে। রহমতকে দেখেই তার পেট বরাবর একটা ঘুষি চালিয়ে দিল। তার হাতে জোর আছে। রহমত ব্যাথায় ককিয়ে উঠল।
“এতো জোরে মারলি?”
“এটা জোর হল?” জিনিয়া চোখ কুঁচকে বলল। “ঠিক আছো তো? দম নিতে পারছ?”
রহমত ধপাস করে বসে পড়ল। “বয়েস হয়েছে রে। আগের মত তো আর নই।”
বাবার দিকে তাকিয়ে একটা বিরক্ত চাহনী দিল জিনিয়া। হাত মেলানো কিংবা কোলাকুলি করবার কোন চেষ্টা করল না। সশব্দে চেয়ারে বসল। “তখনই বলেছিলাম, এইসব ছুড়ী টুড়ী বিয়ে কর না। এখন হল? ঝামেলা হচ্ছে, ঠিক কিনা?”
মিজান মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসল। “আমার উপর এতো রাগ কেন তোর? জানিস তো

তোর মাকে আমি কত ভালবাসতাম। সে চলে যাবার পর তোরা সব চলে গেলি, আমার সময় কাটে কিভাবে?"
কনুই দিয়ে রহমতকে একটা গুতা দিল জিনিয়া। "এই বুড়ার সময় কাটে কিভাবে?"
মিজান শ্রাগ করল। "ও তো বরাবরই ঐরকম। আমি সংসারী মানুষ। আমার মত বয়েস হোক, তখন বুঝবি।"
জিনিয়া মুখ বাঁকাল। "বললেই হয়, কচি মেয়ে দেখে লোভ সামলাতে পারনি। কত টালবাহানা! যাক গিয়ে, খাবারের অর্ডার দেয়া যাক। ক্ষিধায় আমার নাড়ীভুড়ি হজম হয়ে যাচ্ছে।"
হাত উঁচিয়ে একজন ওয়েট্রসকে ডাকল সে। অর্ডার দেয়া হল। রহমতের দিকে ফিরল জিনিয়া। "আঙ্কেল, তুমি এখনও বাবার পেছন পেছনই ঘুরছ? তোমার নিজের কোন জীবন নেই? লজ্জা হওয়া উচিৎ তোমার।"
রহমত ওর কথা শুনে হাসতে লাগল। মেয়েটাকে এই জন্য তার এতো ভালো লাগে। যা মুখে আসে তাই বলে, কোন রাখ ঢাক করে না।
মিজান বলল, "এভাবে বলছিস কেন? মানুষকে সম্মান করে কথা বলতে হয়।"
জিনিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, "থাক, আমাকে ভদ্রতা শেখাতে হবে না। নিজের ছেলেমেয়েদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এতো বড় একটা কাজ করলে, তখন তোমার ভদ্রতা কোথায় ছিল? আমরা যে মনে কষ্ট পেতে পারি, সেটা ভুলে গিয়েছিলে? আর আমার কাছে একলা থাকার কথা বলবে না। আমি তো তোমার সাথেই থাকতাম। তোমার বিয়ের কথা শোনার পরই বাসা ছেড়েছি।"
মিজান নিচু গলায় বলল, "তুই কি আমার সাথে সারা জীবন থাকতিস? তোর নিজের জীবন নেই? একদিন তো যেতিসই। তখন তো আমি আবার একা হয়ে পড়তাম।"
জিনিয়া কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, মালেক তাকে থামাল। "এইসব কথা বলে কোন লাভ নেই। বাবা, আমাদেরকে কেন ডেকেছ বল।"
একটা লম্বা শ্বাস নিল মিজান। ব্যাপারটাকে সুন্দর করে উপাস্থাপন করার উপর নির্ভর করছে তার সফলতা। জিনিয়াকে রাজী করাতে না পারলে মালেক কোন অবস্থাতেই রাজী হবে না। কিন্তু সে একটু চেষ্টা করলে বোনকে রাজী করাতে পারে। সুতরাং মালেককে দলে টানতে পারাটাও জরুরী।
পরবর্তি ঘন্টা খানেক সময় নিয়ে খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে একটু একটু করে জুলেখার মানসিক সমস্যার কথা অল্প বিস্তর ব্যাখ্যা করল মিজান, কিন্তু খুলে কিছুই বলল না। মাল্টিপল পার্সোনালিটির সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়, কিন্তু চাঁদনী যে ইতিমধ্যেই কিছু অভাবনীয় কান্ড ঘটিয়েছে, সেগুলোর কোন উল্লেখ করে না। পরিশেষে যোগ করল, জুলেখাও ওদেরকে দেখতে চেয়েছে।
সব শোনার পর জিনিয়া সোজা সাপটা বলল, "তোমাকে আমরা কেন সাহায্য করব? বিয়ে করতে যখন মানা করেছিলাম তখন আমাদের কথা শুনেছিলে?"
মিজান করুণ গলায় বলল, "ভুল তো করে ফেলেছি। এবার বাঁচা।"
মালেক বোনের দিকে তাকাল। "সপ্তাহ খানেক এসে না হয় থাকলাম। মায়ের কত স্মৃতি আছে সেখানে। ভালোই লাগবে।"

ভাইকে শাঁসাল জিনিয়া, "তুমি এতো সহজে গলে যাও কেন, ভাইয়া? এখন কোন কথা দেবার দরকার নেই। আমরা পরে আলাপ করে ঠিক করব। বাবার যা ইচ্ছা হবে তাই করবে নাকি? একবার বিয়ে করছে, যখন সামলাতে পারছে না তখন আমাদেরকে এসে তাকে উদ্ধার করতে বলছে – এটা কি ফাজলামী নাকি? ভুগুক কিছুদিন। আমাদের কি?"
মালেক কখনই সরাসরি বোনের বিরোধিতা করে না। সে মৃদু হেসে বলল, "বাবা, আমরা তোমাকে পরে জানাব। বেশি চিন্তা কর না। এখানে নানা ধরণের চিকিৎসার সুযোগ আছে। জুলেখার যদি কোন সমস্যা থেকেও থাকে, ঠিক হয়ে যাবে।"
জিনিয়া অবাক হয়ে বলল, "আরে, তুমি কি বাবার নতুন বউকে নাম ধরে ডাকবে নাকি?"
মালেক শ্রাগ করল। "সে তো আমার চেয়ে কয়েক বছরের ছোট। ডাকলে কি অসুবিধা?"
"তাহলে আমিও নাম ধরে ডাকব," জিনিয়া ঘোষনা দিল। মিজানের দিকে তাকাল। "তোমার কোন আপত্তি নেই তো?"
মিজান বলল, "তোদের যা ইচ্ছা ডাকিস। জুলেখার আপত্তি না থাকলেই হল।"
মুখ বাঁকাল জিনিয়া। যেন বোঝাতে চাইল, জুলেখার আপত্তি থাকা না থাকা নিয়ে মাথা ঘামাতে তার বয়েই গেছে।
বিদায় নেবার আগে মিজানের সাথে আবার কোলাকুলি করল মালেক। জিনিয়া রহমতের পায়ে একটা লাথি দিল এবং মিজানকে ধাক্কা দিয়ে প্রায় মাটিতে ফেলে দেবার উপক্রম করে ভাইয়ের পিছু নিয়ে চলে গেল।
রহমত হাসতে হাসতে বলল, "পাগলীটার কোন পরিবর্তন হয় নি। জুলেখা ভাবীর সাথে একই বাসায় গিয়ে উঠলে, দুই জনের মধ্যে মারপিট না শুরু হয়ে যায়।"
হেসে ফেলল মিজান। "রাজী হবে মনে হয়?"
শ্রাগ করল রহমত। "মালেক রাজী মনে হল। জিনিয়া তো খামখেয়ালি। কি সিদ্ধান্ত নেবে কে জানে। কাল রাতে জিনিয়াকে আরেকটা ফোন দিবি। মনে হচ্ছে রাগ পড়ে আসছে। চল, এবার যাওয়া দরকার। দেরী হলে দৌলত মিয়া আবার সটকে পড়তে পারে।"
মিজান জুলেখাকে একটা ফোন করল। তার যে ফিরতে দেরী হবে জানানো দরকার। দুশ্চিন্তা করতে পারে। সন্দেহ করতে পারে। জুলেখা ফোন ধরল না। এতো তাড়াতাড়ি সে কখন ঘুমায় না। হয়ত বাথরুমে। একটা ভয়েস মেইল রাখল মিজান। *ড্যানফর্থে এক বন্ধুর বাসায় যাচ্ছে। ফিরতে একটু দেরী হতে পারে।*